সাতদিন

৯ এপ্রিল : সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপিসহ বিরোধীদলীয় জোট আহূত ৭২ ঘণ্টার হরতালের প্রথম দিনে ব্যাপক সহিংস ঘটনা ঘটে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থান হতে পুলিশ ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রামকে হরতালমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আওয়ামী লীগ যথারীতি শান্তি মিছিল বের করেছে।

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিরোধীদলীয় জোটকে হরতাল কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে।

১০ এপ্রিল : একটানা ৭২ ঘণ্টা হরতালের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ও বোমাবাজিতে ৫০ জন আহত হয়েছে। গ্রেপ্তার শতাধিক। চট্টগ্রাম-নাজিরহাট রুটে রেল লাইন উপড়ে ফেলায় এই পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বড় মগবাজার ডাক্তারের গলিতে দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাতি শেষে লুণ্ঠিত মালপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবেশীর গুলিতে এক ডাকাত নিহত এবং ভবনের দারোয়ান গুলিবদ্ধ হয়।

১১ এপ্রিল : লাগাতার ৭২ ঘণ্টার হরতালের শেষ দিনে নয়াপল্টনে বোমাবাজি ও সংঘর্ষের পর পুলিশ বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবরুদ্ধ করে রাখে।

আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির এক সভায় শেখ হাসিনা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় জনসংযোগ অব্যাহত রাখাসহ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার জন্য দলীয় এমপিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

১২ এপ্রিল : দেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। সংসদের সমাপনী অধিবেশনে ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সংবিধানের বিধান মতেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

শীঘ্রই সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপিসহ চার বিরোধীদল আগামী ২৩, ২৪, ২৫ এপ্রিল সারা দেশে একটানা ৭২ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করেছে।

১৩ এপ্রিল : চট্টগ্রাম আইনজীবীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলাকারীরা ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ হামলাকারীদের ক্ষমা করেছেন।

বৃষ্টিবিহীন রুক্ষ এই মহামারীতে বৃষ্টির প্রত্যাশায় বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ মোনাজাত হয়েছে।

১৪ এপ্রিল : ঢাকার রমনা বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের ন্যক্কারজনক ঘটনায় সর্বত্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সর্বমহলে নেমে এসেছে শোকের ছায়া, বোমা বিস্ফোরণে প্রাণহানি ঘটেছে ৯ জনের, আহত হয়েছে অর্ধশতাধিক।

১৫ এপ্রিল : বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সভায় আগাম নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। বিএনপি এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার পাশাপাশি, জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রমনা বটমূলে নৃশংস বোমা হামলায় ৯জনের মৃত্যুতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সারা দেশে। সর্বত্র প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বোমা দিয়ে বর্ষবরণ

এমন একটা সময়ের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে যখন অন্তর্ঘাতী খুনিরা প্রেতনৃত্য নাচছে আমাদের সামনে। বীভৎস পন্থায় মানুষ মারছে। এদের আক্রোশ বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে। রুখে দাঁড়ান... লিখেছেন **খসরু চৌধুরী**

এ কোন সময়ের মুখোমুখি আমরা? বর্ষ শুরু হলো জনসমাগমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে! মুহূর্তে রক্তাক্ত, খন্ডিত, বীভৎস বিকৃত হয়ে লাশ হয়ে গেল কতিপয় মানুষ। স্তম্ভিত দেশবাসী, শোকে বাকরুদ্ধ। নববর্ষের উৎসব পরিণত হলো মর্মান্তিক শোকের ঘটনায়। ঘটনায় এ পর্যন্ত নিহত নয়জন, মৃত্যুর প্রহর গুনছেন অনেকে।

আতঙ্কিত দেশে আরও আতঙ্কযুক্ত হলে আমাদের সয়ে যাওয়া দেশবাসীর পাথরমনের ওপর হয়তো তেমন ছাপ ফেলে না। কিন্তু এবারের ঘটনায় প্রতিটি মানুষের কাছে নিজের ছায়াই অবিশ্বস্ত হয়ে উঠছে। মানুষ জেনে গেছে তার বীভৎস মৃত্যুর জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীর প্রতিপক্ষ হবার দরকার নেই। বোমাবাজদের বোমার আওতায় তার শরীর থাকলেই যথেষ্ট। নিরপরাধ, অপরাধী, পক্ষ-বিপক্ষ যেই হোন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ বোমাবাজদের শীতল শিকার। বোমাবাজদের সাফল্য মানুষ মৃত্যুর হার আর আতঙ্কের পরিমাণ ছড়ানোর মধ্যে।

বোমাটি পাতা ছিল রমনা গেটের পাশে

সাধারণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে রাজনীতি করার ঐতিহ্য আমাদের বহু বছরের। মেইনস্ট্রিমের দল, আন্ডারগ্রাউন্ডে লুকিয়ে থাকা দল, গণতন্ত্রী, বামপন্থী, সামরিক, স্বৈরাচারী– সব ধরনের রাজনৈতিক ভায়োলেন্সে লাশের প্রয়োজন আমাদের ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ ধরনের খুনোখুনির একটা চরিত্র ছিল। খুন করা তো পক্ষ-বিপক্ষের মানুষদের, যারা কোনো না কোনো পক্ষের মানুষ ছিল। দু'একজন নিরপেক্ষ মানুষ যে ভুলক্রমে অথবা ঘটনার মাঝখানে পড়ে খুন হতেন না সেটা নয়। কিন্তু এদের সংখ্যা নগণ্য। উচ্চশক্তিসম্পন্ন বোমায় মানুষ হত্যার সংস্কৃতিতে পক্ষ-বিপক্ষ নেই, ঠান্ডা মাথায় মানুষ হত্যাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পুলিশের কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা আছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গোয়েন্দা বাহিনী রয়েছে। কিন্তু দেশে এতগুলো বোমাবাজির ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও এরা বোমাবাজদের চিহ্নিত, নিবৃত্ত করতে পারছে না।

এই বোমাবাজির ঘটনাগুলো সাদা চোখে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বিষয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এক. বোমাবাজরা মেইনস্ট্রিমের দলগুলোর সমাবেশে বোমাবাজির সাহস পায় না।

দুই. এরা বেছে নিচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক দলগুলোর সমাবেশ।

তিন. এদের আরেক টার্গেট প্রগতিশীল অপেক্ষাকৃত নিরীহ রাজনৈতিক দলের সমাবেশ।

চার. এদের অন্য টার্গেট দেশের শিয়া জনগোষ্ঠীর সমাবেশ।

পাঁচ. এরা নেতা-কর্মী হত্যার চেয়ে সমাবেশে আগত নিরীহ জনতা হত্যার জন্য বেশি উদগ্রীব।

যে দল বা সমাবেশকে আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এরা সবাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ধর্মীয় উন্মাদনা বিরোধী। স্বভাবতই মৌলবাদীদের আক্রোশ এদের ওপর পড়বে। সন্দেহ থেকে যায় ধর্মোন্মাদ সংগঠনগুলোর ওপর।

দেশের জন্য বর্তমান সময়টা অত্যন্ত নাজুক। সামনে নির্বাচন। সরকার, বিরোধী দল ক্ষমতার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। দেশে চলছে হরতাল, মিটিং-মিছিল, সন্ত্রাসী হামলা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আগে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে এরা কোনো কিছু করতেই পিছপা নয়। দেশে তেলের আভাস থাকায় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল যে কোনো মূল্যে তাদের লগ্নি, মুনাফা তুলতে স্থিতিশীল পরিবেশ চাচ্ছে। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীরও একই চাহিদা। এই অবস্থায় গ্রহণযোগ্য যে কোনো দল বা দলগোষ্ঠীকে এরা ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা চালাবে। সেটা দেশের গণতন্ত্রমনা জনগোষ্ঠীর পছন্দ না হলেও। নাইজেরিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের মনে রাখতে হবে।

এই ঘোরতর দুঃসময়ে দেশবাসী তাকিয়ে আছে মেইনস্ট্রিমের দলগুলোর দিকে। জনতা এখনও তাদের পক্ষেই আছে। তারা কোনো মতেই তাদের নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ঘাতী দলগুলোর হাতে তুলে দিতে পারে না। সরকার ও বিরোধী, উভয়েরই আশ্রয়ে বিপুল সংখ্যক সন্ত্রাসীর উপস্থিতি নিত্যদিনের পত্রিকায় আসছে। বোমাখুনিরাও যে এদের ছত্রছায়া ব্যবহার করছে না সেটা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার নয়। এ ব্যাপারে এদের ভূমিকাও স্বচ্ছ নয়। দেশের রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে এদের উদ্যোগ নেয়া উচিত, ধর্মোন্মাদ বোমাবাজদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা। ধর্ম উন্মাদনা এমন একটি বিষয় যেটা প্রচলিত রাজনীতিতে জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলে জনতার মধ্যে দাবানলের মত ছড়ায়। সচেতন না হলে মেইনস্ট্রিম দলগুলো কখন যে নেতৃত্ব হারাবেন সেটা তারা বুঝতেই পারবে না। এই অবস্থায় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, শক্ত হাতে আপনারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন, বিরোধীদের প্রতি আবেদন, বোমাবাজরা আপনাদেরও ছাড়বে না, এদের ধরিয়ে দিন।

হাসিনা-খালেদা চিরস্থায়ী বিরোধ

'৯৬-এর নির্বাচনের পর থেকেই দুই দলের এই নেতারা সর্বক্ষণ বিরোধী পক্ষের কঠোর সমালোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। দলের প্রতি এমন নিষ্ঠা দেখায়, মনে হয় এরা দুই নেত্রীর চেয়ে দলের বড় শুভাকাঙ্ক্ষী... **শারদ রহমান**

চারের থেকে এক গেলে বাকি থাকে তিন। বিরোধীদলীয় জোট এখন তিন-এ এসে দাঁড়িয়েছে যা প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্য সংখ্যা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচন্ডভাবে বিশ্বাস করেন তিন তাঁর শুভ সংখ্যা। এবং এই সংখ্যা তার ভাগ্যে অনেক পরিবর্তন এনেছে। এবারো তিনি নির্বাচনী যাত্রা তিন দিয়ে শুরু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন ঘনিষ্ট সহযোগীর বিরোধিতার কারণে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি।

সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, নির্বাচনে জিততে হলে নির্বাচনের আগেই বিরোধী জোটকে ভেঙে ফেলতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনি ইতিমধ্যেই কিছুট সফল। সম্প্রতি এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি জোট ভেঙে বের হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে নাজিউরের অনুসারীরা জোটে থাকলেও তা কোনো গুরুত্ব রাখেনা। ৪ এপ্রিল ইসলামী ঐক্যজোটের মুফতি আমিনীর নেতৃত্বে ঐক্যজোটের বড় অংশ জোট থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে ইসলামী ঐক্যজোটের কয়েকটি শরীক দল সরকারী নীতি নিধারকদের সঙ্গে আন্দোলন ও আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছে। সময় সুযোগ বোঝে যে কোনো সময় তারা জোট ছুটের সিদ্ধান্ত নেবে। এদিকে জামায়তও ভিন্ন চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। তারা ইতিমধ্যেই জোট বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। তারা বলেছেন বর্ষার আগেই নির্বাচন সম্ভব। অথচ খালেদা জিয়া বলেছেন বর্ষার আগে নির্বাচন সম্ভব নয়। এর পরপরই জামায়াত বলেছে জোট রাখা সকল দায় দায়িত্ব বিএনপির জামায়েতের নয়।

বিরোধী জোট ভাঙার চেষ্টার পাশাপাশি বিএনপি'র যেসব নেতা রাজপথে বেশি তৎপর তাদের ওপর নির্যাতন ও গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালাবে। এছাড়া সরকার বিএনপি'র ভেতরেও ভাঙনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এতে যদি খুব একটা সফল না হয় তাহলে বড় ও মাঝারি মাপের কিছু নেতাকে দলে টানার চেষ্টা করবে, এতে সফলতা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে

দুই দলের সূত্রই জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। আবার অনেকের সঙ্গে আলাপ চলছে। তবে সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে বিরোধী দল যাতে কোনোভাবেই নির্বাচনের নির্বাচনের আগে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে।

এদিকে সরকারি ও বিরোধী দলের কিছু নেতা পারিবারিক রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে নতুন ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাঠে নেমেছে। এই দলটি কখনোই সরকার ও বিরোধী দলকে কাছাকাছি আসতে দেয়নি। তারা সবসময় দুই দলকে দুই মেরুতে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবার নির্বাচনী ঘোষণার মাধ্যমে যে সমঝোতা হতে যাচ্ছিল তাদের প্রচেষ্টায় তাও ভেঙে যায়।

'৯৬-এর নির্বাচনের পর থেকেই দুই দলের এই নেতারা সর্বক্ষণ বিরোধী পক্ষের কঠোর সমালোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। দলের প্রতি এমন নিষ্ঠা দেখায়, মনে হয় এরা দুই নেত্রীর চেয়ে দলের বড় শুভাকাঙ্ক্ষী। বিরোধী দলের এই নেতারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভের পর থেকেই কঠোর আন্দোলন করার ব্যাপারে দলকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। প্রথমদিকে তারাই নেত্রীকে দিয়ে বিভিন্ন রকম কর্মসূচি দিয়েছে। সময়ের আগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করায় একদিকে সরকারকে যেমন হটানো যায়নি তেমনি সরকারি নির্যাতনের ফলে বিরোধী নেতা-কর্মীরা গৃহহারা এবং জেল-হাজতে বসবাস করছে। এতে বিরোধী দলের ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। ফলে বিরোধী দল হরতাল ডাকা সত্ত্বেও বিরোধী নেতা-কর্মীদের রাজপথে দেখা যায় না। এরাই বেগম খালেদা জিয়াকে অনেকটা চাপের মুখে ফেলে বিরোধী ঐক্যজোট গঠন করেছে। নেত্রীকে বুঝিয়েছে জোট গঠন করলে ৭৭ শতাংশ ভোট তাদের বাক্সে পড়বে। এখানে বিএনপি তাদরে রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভুল করে বসে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে বিএনপি সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও এই জোট করে দলের বিকাশে আন্তরায় সৃষ্টি করে। তারা যদি এককভাবে আন্দোলন বা রাজনীতি করতো তাহলে দলের বিকাশ ঘটতো। দলীয় ভিত্তিও মজবুত হতো। বিরোধী জোট গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনে জেতার যে স্বপ্ন দেখেছিল তাও নির্বাচন শুরু না হতেই জোট ভাঙার পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

অপরদিকে সরকারি দলের কট্টরপন্থি মন্ত্রী-নেতারা সব সময় প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলের ওপর নিষ্পেষণ চালানোর জন্য প্ররোচিত করেছে। এরা প্রচার চালিয়েছে, বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। এমনকি মানিকগঞ্জের ঝিটকায় বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়ার অভিযোগে বিএনপি'র চার নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে আদালতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে নানারকম উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করেছে। কালো আইন জননিরাপত্তা আইন তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রীও বিরোধীদলের সঙ্গে সহিষ্ণুতার মনোভাব ত্যাগ করে এদের ফাঁদে পা দিয়েছেন।

অবেশেষে প্রধানমন্ত্রী মদিনা শরীফে নির্বাচনের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেখান থেকেও তাকে সরিয়ে নিয়েছেন। এমনকি ৩০ মার্চের মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে বলিয়েছেন, নির্বাচন করতে হলে বিরোধী নেত্রীকে নাকে খত দিয়ে আসতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্র মতে, তিন সংখ্যার প্রতি তাঁর প্রচন্ড দুর্বলতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন মার্চ মাসের ৩০ তারিখে খালেদা জিয়া সরকারের পতন হয়েছে। ১২ জুনের নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়েছেন। তাই তিনি মদিনা শরীফ থেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০০১ সালের ১২ জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। এমনকি ৩০ মার্চের মহাসমাবেশে সরকারি-ভাবে তাঁর নির্বাচনী তারিখ ঘোষণা দেওয়ায় কথা ছিল। এই তারিখগুলোর সব কয়টিই 'সংখ্যা সূচক তিন'।

সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতারা দুই নেত্রীর সব পরিকল্পনা উল্টে দিয়েছে। বিএনপি এদের কারণে এই সরকারের পৌনে পাঁচ বছর সময়ে সুস্থ রাজনীতির পরবর্তী উল্টো পথে চলেছে। উল্টো পথে চলার ফলে সংসদেও থাকেননি আন্দোলনেও ব্যর্থ হয়েছে। তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত তাঁর শুভ সংখ্যা 'তিন'-এ স্থির থাকতে পারেননি।

মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী
আয়না দেখুন...

পর্দায় নিজ মুখ দেখতে কার না ভালো লাগে! তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছোট পর্দায় নিজের ও নিজের প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখতেই অভ্যস্ত। সেখানে বেসরকারি টেলিভিশন অন্যদেরও মুখ মাঝে মাঝে দেখায়। এতে কার না রাগ হয়। তাছাড়া বেসরকারি টেলিভিশনে যেটুকু তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে তাতে জনগণ অভ্যস্ত হয়ে পড়লে আর বানানো সংবাদ দেখবে না... লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনের পর্দায় সদা উপস্থিত তথ্য প্রতিমন্ত্রী বেসরকারি টেলিভিশনগুলোকে একহাত নিয়েছেন। সংসদে তার দলীয় সাংসদ প্রশ্ন করেছিলেন যে, একুশে টেলিভিশন যেরকম সংবাদ পরিবেশন করে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন তা করতে পারে না? বিটিভি'র সংবাদ দেখতে মানুষের অনীহা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে ঐ সংসদ সদস্য মন্তব্য করেন। কিন্তু তথ্য প্রতিমন্ত্রী তা মানতে রাজি হননি। তিনি সাংসাদদের প্রশ্নোত্তরে দাবি করেছেন যে, বেসরকারি টেলিভিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বাদ দিয়ে দু' চারটি স্পর্শকাতর সংবাদ পরিবেশন করে নেতিবাচক মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় যা বিটিভি করবে না। তথ্য প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেন, নেতিবাচক স্পর্শকাতর সংবাদ পরিবেশন করে সস্তা জনপ্রিয়তা বা বাহবা কুড়ানো বিটিভির উদ্দেশ্য নয়। তথ্য প্রতিমন্ত্রী অবশ্য স্পর্শকাতর সংবাদের কোনো সংজ্ঞা দেননি। এই স্পর্শকাতর সংবাদ যদি দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী হয় তবে বিটিভিই বরং সেই সংবাদ বেশি পরিবেশন করে। প্রধানমন্ত্রীসহ নানা মন্ত্রীদের কর্মকাণ্ডের সচিত্র স্বকণ্ঠ সংবাদ পরিবেশন কো সব সময়ই হয়ে থাকে। তার সঙ্গে বর্তমান তথ্য প্রতিমন্ত্রীর আমলে সংবাদ পরিবেশনার সময় মন্তব্যসহ সচিত্র প্রতিবেদন, 'জাতির বিবেক' নামে দলীয় প্রচারমূলক অনুষ্ঠান, বিরোধী দলের কর্মসূচি সম্পর্কে বিভিন্ন জেলার সংবাদদাতাদের স্বকণ্ঠে অথচ একই ভাষায় দেয়া রিপোর্টও ঐ সংবাদের সঙ্গে অথবা সংবাদ পরিবেশনার পরপরই প্রচার করা হয়। সংবাদের সঙ্গে প্রচারিত হওয়া ঐ সব মন্তব্য ও অনুষ্ঠান সংবাদের গুরুত্বই বহন করে। সেদিক দিয়ে বেসরকারি টেলিভিশন সেসব কিছু করে না। সে সুযোগও তাদের নেই। কারণ সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বিটিভির ইংরেজি সংবাদ তাদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রচার করতে হয়। আর নিজেদের সংবাদের ক্ষেত্রেও তারা সরকারি নীতিমালা দ্বারা বন্দী। তাকে অতিক্রম করতে

পারে না। আর বেসরকারি টেলিভিশনের মালিকরা পাওয়ার এলিটদের বাইরের কেউ নন যে এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলবেন। তা ছাড়া সরকারি রোষানলের ব্যাপার তো আছে। শখ করে কে সেই রোষানলে পড়তে চাইবে। তার ওপর দেশের একমাত্র বেসরকারি টিভি একুশে টিভির মালিকদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নিজের ঘরের লোক আছে বলে জনশ্রুতি আছে। না হলেও একুশে টিভি যে একেবারে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে তা বলা যাবে না। যেখানে ঘটনাবলী সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি চলে যায় সেখানে 'হয়ত' 'কিন্তু' যোগ করে ব্যালান্স করার চেষ্টা করে। এর বড় উদাহরণ ছিল ১৩ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ডা. ইকবালের নেতৃত্বাধীন হরতাল বিরোধী মিছিল থেকে গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে একুশে টিভির সংবাদ। ডা. ইকবালকে বাঁচাতে ঐ ঘটনার দায় সম্পর্কে এও হতে পারে, অন্যটাও হতে পারে বলে একুশে টিভি মূল বিষয় পাশ কাটিয়ে যায়। পরদিন প্রিন্ট মিডিয়ায় ছাপা ছবি ঐ ঘটনার দায়দায়িত্ব পরিষ্কার করে দিয়েছিল। একুশে টিভি ঐ ছবি হাতে পেয়েও প্রচার করেনি– যা যে কোনো টিভি খুবই আগ্রহভরে প্রচার করত। একই কথা বিরোধী চারদলের 'হরতাল' নিয়ে। একুশে টিভি হরতাল সম্পর্কে আগাম মন্তব্য করার জন্য সিপিবি'র কাছে ছুটে গেছে এবং তারা তাদের ইচ্ছাও পূরণ করেছে। সিপিবি'র সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম একুশে টিভিকে বলেছে, ১৭ দিনের জন্য এই হরতালের অর্থ হয় না। একুশে টেলিভিশন সুকৌশলে বিরোধী চারদলের হরতাল সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বক্তব্যকেই এভাবে সুকৌশলে প্রচার করেছে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে, বিটিভি জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন ও জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রচার করে, যেটা বেসরকারি টিভি করে না। এক্ষেত্রেও তথ্য প্রতিমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন যে, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন বলতে তারা যা বোঝেন তাই বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে। এবার পনেরো আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে সব টিভি চ্যানেলই এক সঙ্গে রাত-দিনভর আওয়ামী শোকগাথা প্রচার করেছে। ঐদিন কোনো চ্যানেল দেখে মনে হয়নি বাংলাদেশে কোনো বেসরকারি টিভি চ্যানেল আছে।

তারপরও তথ্য প্রতিমন্ত্রী চান যে, বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো সরকারের ইচ্ছামত সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করুক। বস্তুত, টেলিভিশন নিয়ে সরকারই বরং স্পর্শকাতর। টেলিভিশন নিয়ে সরকারের এই স্পর্শকাতরতা বাংলাদেশ টেলিভিশনকে সত্যিকার অর্থে 'বোকার বাক্স' বানিয়ে রেখেছে শুরু থেকেই। 'আয়না তুমি কার? যখন যার হাতে তার'– ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা আধুনিক যুগে বিটিভি ছাড়া আর কারও ব্যাপারে এতখানি সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি বোধ হয়।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী সংসদের প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটিভির কিছু দায়বদ্ধতা আছে যা বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে নাই। এ দায়বদ্ধতার ভিত্তিতেই বিটিভি তার অনুষ্ঠান পরিচালনা করে এবং ভারসাম্যমূলক সংবাদ পরিবেশন করে। এই ভারসাম্য যে সব সময়ই সরকারের দিকে ঝুলে থাকে তা আর বলার অবকাশ নেই। সে কারণেই এরশাদের আমলে বিটিভি ছিল 'সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্স', খালেদার আমলে 'বিবি-গোলামের বাক্স' আর হাল আমলে কারও মতে 'বাপ-বেটির বাক্স'। আর 'প্রথম আলো' টিভিতে 'আলপিন' ফুটিয়েছে তাকে 'বঙ্গবন্ধু টিভি' আখ্যা দিয়ে। তথ্য প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে ঐ টিভির দায়বদ্ধতা তাই কার কাছে! নিঃসন্দেহে ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে। সে কথাই

একই যাত্রায় বিচিত্র ফল

একই যাত্রায় পৃথক ফল নয় কেবল, বিচিত্র সব ফলাফল দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি। আওয়ামী লীগ নেতা ডা. ইকবালের হরতালের মিছিল থেকে গুলিবর্ষণের যে সচিত্র খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাতে দেশবাসী মনে করেছিল সেইসব অস্ত্রধারীদের পুলিশ নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় চলে গেলেও পুলিশ তা করেনি। বরং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রশ্ন তুলেছেন যে, এক পক্ষের ছবি ছাপা হল কেন? প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে এক পা এগিয়ে সাগর পাড়ের কলামিস্ট গাফ্‌ফার চৌধুরী ঐ ছবিগুলোকে 'ক্যামেরা ট্রিকস' প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘ বয়ানই ফেঁদে বসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিএনপি'র একটি মিছিল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করা অস্ত্রধারী মাস্তানদের অ্যাকশন ছবি ছাপা হলে আর তারা কিছু বলেনি। পুলিশও যেন মুখিয়ে বসেছিল। নাইন শুটার শর্টগান খ্যাত লিটন, টেম্পোচালক হত্যাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডার হেমায়েত, ডা. ইকবালের মিছিলের অস্ত্রধারীদের স্পষ্ট ছবি পত্রিকায় প্রকাশ হলেও পুলিশ তাদের নাকি গ্রেপ্তারের জন্য খুঁজে পায়নি। কিন্তু এবার বিরোধী বিএনপি'র কথিত 'ক্যাডার'দের খুঁজে পেতে পুলিশের মোটেও দেরি হয়নি। কিন্তু একই যাত্রায় এই পৃথক ফলে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় পুলিশ পরদিন আরো ১২জন অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার করে অস্ত্রসহ ছবি ছাপিয়ে বলে যে, এরা ডা. ইকবালের মিছিলের অস্ত্রধারী ব্যক্তি যারা গুলি ছুঁড়েছিল। কিন্তু পুলিশ সূত্রের সেই বয়ানও টেকেনি। কারণ পরদিনই সংবাদপত্রগুলো ফাঁস করে দেয় যে গ্রেপ্তারকৃত এসব ব্যক্তিরা ডা. ইকবালের মিছিলের ছবির সেই অস্ত্রধারী নয়। পুলিশ অবশ্য এখন এই বলে অস্বীকার করছে যে, তারা কেউ এ ধরনের খবর দেয়নি। পত্রিকার খবর, পুলিশের অস্বীকৃতি মিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে এদেশের পুলিশ বা আইন কেবল বিচিত্র নয়, তাদের গতিও বিচিত্র।

ফলস স্টার্ট হলে কি হবে

প্রধানমন্ত্রী তার সংসদ সদস্যদের বলেছেন যে, যে কোনো সময় নির্বাচনের হুইসেল বাজতে পারে এবং হুইসেল বাজলেই যেন তারা দৌঁড়াতে পারেন ও বিজয়ী হতে পারেন তার জন্য সংসদ সদস্যদের প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য 'ফলস স্টার্ট' নিলে কি হবে তা বলেননি। কিন্তু মদিনা শরিফে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে অনেকেই মনে করেছিলেন যে বাঁশি বেজে গেছে। তারা নির্বাচনী এলাকায় চলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখছেন খরচ-খরচান্তই সার, নির্বাচন এখনও ঝুলছে। তবে এই ঝুলতে ঝুলতেই নির্বাচন এসে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এরা দম রাখতে পারবেন কিনা সেটাই প্রশ্ন!

দেরিতে বুঝিলি রাম

জামাতের মহাসচিব মুজাহিদের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে পুলিশ জামাত-শিবিরের কর্মীদের বেধড়ক পিটিয়েছে। গ্রেপ্তারও করেছে সতেকের ওপর। এ সম্পর্কে জাতীয় সংসদে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম বলেছেন, দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী জামাতিদের কঠোরভাবে দমন করা ছাড়া উপায় নেই। তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদে জামাত-শিবিরের তাণ্ডবের কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য বিরোধীদলে থাকার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম এই জামাতিদের তাদের আন্দোলনের সাথি করার জন্য তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন। এমনকি জামাতিরা বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের রগ কেটে দেয়া, চোখ তুলে নেয়ার পরও। এখন সেই জামাত সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেই বলে দেরিতে বুঝিলি রাম।

বলেছিলেন বিএনপি'র তথ্যমন্ত্রী– 'আমাদের সরকার'। আমাদের টেলিভিশন নিয়ে যা খুশি করব তাতে অন্যের কি বলার আছে।' আর এখন টেলিভিশনে ইনফরমেশন নয় কেবল, ডিসইনফরমেশন কিভাবে প্রচার করা হবে সেটাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

টেলিভিশন নিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর ঐ মন্তব্য বরং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা দেয়ার সরকারের দাবিকেই নাকচ করে। তথ্য প্রতিমন্ত্রীসহ সরকার প্রায়শই দাবি করে যে, বেসরকারি খাতে টিভি-বেতার স্থাপনের মাধ্যমে সরকার টিভিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার চাইতেও সাহসী ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু এখন সেই বেসরকারি টিভির সংবাদ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারের সাহস বা উদ্যোগী ভূমিকা কোথায়? বরং এ ধরনের কথা বলে তাদের চোখ রাঙানো হচ্ছে। তথ্য প্রতিমন্ত্রী যখন সংসদে দাঁড়িয়ে বেসরকারি টেলিভিশনের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগ আনেন তখন তারা নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন। এ কারণে দেখা যায় যে, বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টিভির সংবাদ পরিবেশনায় দারুণ রকম আপ্‌স এন্ড ডাউন হচ্ছে। সংবাদ পরিবেশনায় এ ধরনের অসঙ্গতি একুশে টিভির সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও নষ্ট করবে। তথ্য প্রতিমন্ত্রী সম্ভবত সেটাই চাইছেন। তাতে তাদের লাভ এ কারণে যে, নির্বাচনকে সামনে রেখে বেসরকারি টেলিভিশন আরো একটু বেশি সাহসী হতে পারবে না।

অন্যদিকে টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন তো সোনার হরিণ। তিন জোটের অঙ্গীকারে রেডিও-টেলিভিশনসহ সব প্রচার মাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার করা হলেও খালেদা-হাসিনা কেউ সে কথা রাখেনি। আওয়ামী লীগ শাসনে টেলিভিশনে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে গঠিত কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেছে বহু আগে। ঐ কমিটিতে কিছু আমলা ও আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া কেউ ছিল না। অন্য কারও মতামতও তারা নেয়নি। সেই রিপোর্টও পেশ করা হয়েছে ১৯৯৭-এর জুন মাসে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে তা আবার ফাইলবন্দি হয়েছে। সম্ভবত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট উল্টে দিয়ে যেমন শিক্ষানীতি পাস করা হয়েছে, তেমনি ঐ কমিটির রিপোর্ট উল্টে দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সেরকম কিছু হতে পারে। আর টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ছাড়া যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে না, সেটা আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই।

পর্দায় নিজ মুখ দেখতে কার না ভালো লাগে! তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছোট পর্দায় নিজের ও নিজের প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখতেই অভ্যস্ত। সেখানে বেসরকারি টেলিভিশন অন্যদেরও মুখ মাঝে মাঝে দেখায়। এতে কার না রাগ হয়। তাছাড়া বেসরকারি টেলিভিশনে যেটুকু তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে তাতে জনগণ অভ্যস্ত হয়ে পড়লে আর বানানো সংবাদ দেখবে না। সে সত্য কথাই তার দলীয় সংদদ সদস্যই বলে ফেলেছেন ইটিভি আর বিটিভির সংবাদের তুলনা করতে গিয়ে। তথ্য প্রতিমন্ত্রীর তাই উচিত নিজেদের আয়নাতেই মুখ দেখা। তাহলেই কেবল আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে তারা নিজেরা রক্ষা পাবেন। দেশবাসীও রক্ষা পাবে মিথ্যার হাত থেকে।

বিজ্ঞাপন

নির্বাচনে চরমপন্থীদের অবস্থান

প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দেশের প্রধান চরমপন্থি দলগুলোর সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়। এবারও তারা সন্ত্রাসী ভাড়া করছে।... লিখেছেন যশোর থেকে মামুন রহমান

'আপনি হয়তো জানেন আজ যাদেরকে চরমপন্থি বলা হচ্ছে তারা কেউ স্বেচ্ছায় চরমপন্থি হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোই তাদেরকে চরমপন্থি বানিয়েছে। ফলে তারা সব সময় কোনো না কোনো রাজনৈতিক শক্তির শেল্টারে থাকে। প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিও চায়নি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থিরা আত্মসমর্পণ করুক। কারণ এ দুটি দলই তাদের স্বার্থে চরমপন্থিদের ব্যবহার করে। খোদ আওয়ামী লীগও চায়নি চরমপন্থিরা আত্মসমর্পণ করুক। এজন্যে ৭ জুন (১৯৯৯) আওয়ামী লীগের একটি অংশ আমাকে যশোরে হত্যা করতে চেয়েছিল। আর বিএনপি তো বিরোধিতা করেছিল প্রকাশ্যেই। বিএনপি আর বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির লিফলেট পড়লে বোঝা যায় তারা এক জায়গায় বসে লিখেছে। আওয়ামী লীগের এমপি বীরেন শিকদার (মাগুরা) তো এখনো গোপন দল করেন'।

মেইনস্ট্রিম রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে চরমপন্থিদের কোনো সম্পর্ক আছে কি না– এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে এক সময়ের নামকরা বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মীর ইলিয়াস হোসেন ওরফে দিলীপ উপরোক্ত চাঞ্চল্যকর কথাগুলো বলেছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০কে। এর প্রায় ৭ মাস পর প্রতিপক্ষ চরমপন্থিদের ব্রাশ ফায়ারে তিনি ঝিনাইদহে নিহত হন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ মীর ইলিয়াসের ঐ সাক্ষাৎকারটি ছাপা হওয়ার পর এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অঙ্গনে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে চরমপন্থিদের গোপন সম্পর্কের কথা এত স্পষ্ট করে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেননি। তার বক্তব্য যে কত সঠিক ছিল, জাতীয় নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসায় তা বুঝতে পারছেন চরমপন্থি কবলিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। চরমপন্থিরা নির্বাচনের সময় কে কোথায় কোন দলের পক্ষে কাজ করবে তা ঠিক হয়ে গেছে অনেক আগেই। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাঘা-বাঘা রাজনীতিবিদদের কাছে চরমপন্থিদের এখন বেজায় কদর। এদিক দিয়ে অন্তত একটি ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে টেক্কা দিয়েছে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। তারা ভাগিয়ে নিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক সময়ের অন্যতম শীর্ষ চরমপন্থি (আত্মসমর্পণের পর মুক্ত) খুলনার গাজী কামরুলকে। সরকারের দায়িত্বশীল একটি গোয়েন্দা সংস্থার মতে, বিএনপি'র এক শীর্ষ পর্যায়ের নেতার সাথে ইতিমধ্যে গাজী কামরুলের গোপন বৈঠকও হয়েছে। গাজী কামরুল ও তার লোকজন আগামী নির্বাচনে বিএনপি'র পক্ষে কাজ করবে ঐ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। আর পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরের মত এবারো আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করবে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করবে বিএনপি'র পক্ষে। তবে এই দল দুটির মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকায় কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, আগামী নির্বাচনে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি যশোরের সদর, বাঘারপাড়া, অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর, চৌগাছা ও ঝিকরগাছা উপজেলা, সাতক্ষীরার সদর, আশাশুনি, কলারোয়া ও তালা উপজেলা, খুলনা ও নড়াইলের সব ক'টি উপ-জেলা, বাগেরহাটের মংলা ও রামপাল, কুষ্টিয়ার সদর, খোকশা, মিরপুর ও কুমারখালি, মাগুরা ও ঝিনাইদহের সব ক'টি উপজেলা এবং পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর জেলার মধুপুর এবং রাজবাড়ির বালিয়াকান্দি ও পাংশা উপজেলায় বিএনপি'র পক্ষে কাজ করবে। অন্যদিকে পূর্ব বাংলা কমিউ-নিস্ট পার্টি কাজ করবে যশোরের কেশবপুর, মনিরামপুর, খুলনার সদর, রূপসা, ফুলতলা, ডুমুরিয়া, দাকোপ ও পাইকগাছা, সাতক্ষীরার কলারোয়া, আশাশুনি ও তালা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের সব ক'টি থানা, মাগুরার শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলা এলাকায়। এরমধ্যে খুলনা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও যশোরের একটি অংশে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্টদের ভিত অত্যন্ত শক্ত। তারা কাজ করবে আওয়ামী লীগের পক্ষে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে। ঘটতে পারে একাধিক হত্যাকান্ডও। নির্বাচনে পথের কাঁটা সরাতে এ ধরনের হত্যাকান্ড ঘটানো হতে পারে।

যশোরে সাংবাদিক শামছুর রহমান, খুলনার শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতা এস.এম.এ রব ও বাগেরহাটের জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা কলিদাস বড়াল খুন হওয়ার পর এ অঞ্চলের সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে মৃত্যু আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, সে আতংক এখনো তাদের তাড়া করে ফিরছে। সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দিয়ে এখনো উড়ো চিঠি দেয়া হচ্ছে। যশোরের ৩ জন রাজনীতিবিদ এবং ৫ জন সাংবাদিক এখনো সার্বক্ষণিক পুলিশ নিয়ে চলাফেরা করছেন। বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী খালেদুর রহমান টিটো, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শরীফ আব্দুর রাকিব এবং নিহত জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদের শ্যালক মারুফ হোসেন খোকনের জীবন মোটেই নিরাপদ নয়।

এ অবস্থা আরো ভয়াবহ খুলনায়। সেখানকার সব শীর্ষ নেতাই বর্তমানে আতংকিত জীবনযাপন করছেন। খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম, সাবেক মেয়র কাজী আমিন, খুলনা জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সাহারুজ্জামান মোর্তোজা, সাবেক এমপি আব্দুল গফফার বিশ্বাস, জাপার মহানগর সভাপতি শেখ আবুল হোসেন, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা আজমল আহম্মেদ, অধ্যাপক আশরাফুজ্জামান, হুইপ মোস্তফা রশিদী সুজা ও তার দুই ভাই মোজাফফর রশিদী রেজা ও মোয়াজ্জেম রশিদী দোজা, ওয়ার্ড কমিশনার তসলিম খান, মোহাম্মদ হোসেন মুক্তা প্রমুখের জীবন মোটেই নিরাপদ নয়। আর এ অবস্থার জন্যে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই দায়ী। প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টির জন্যে তাদের অনেকেই সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত আর চরমপন্থিদের লালন-পালন করতেন। যা এখন তাদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবেক কেএমপি কমিশনার আনোয়ারুল ইসলামও এ কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন গত বছরের ৩১ অক্টোবর।

গোপন দলের এক সময়ের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে মীর ইলিয়াস যেমন জানতেন রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে চরমপন্থিদের ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি একজন শীর্ষ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে আনোয়ারুল ইকবালও জানতেন চরমপন্থি দলগুলোর গতিবিধি। জানতেন তারা কখন কাদের ছত্রছায়ায় চলাফেরা করে, কারা তাদের গডফাদার। আর আগামী নির্বাচনে কতজন চরমপন্থি কোন কোন দলের হয়ে কাজ করবে, ইতিমধ্যে তাও বের করে ফেলেছে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। যা তারা জানিয়েছে সরকারের উর্ধ্বতন মহলকেও। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যে রাজনৈতিক দলগুলো চরমপন্থিদের সাথে আঁতাত করায় সাধারণ মানুষ এখন আরো উদ্বিগ্ন।